সত্যের সন্ধানেঃ ০১

কালিমা তাইয়িবা

একটি জীবন-আদর্শের দাওয়াত

(Kalima Taieba : A call for an Ideology)

মুহাম্মাদ আজিজুর রহমান খান

কালিমা তাইয়িবা

একটি জীবন-আদর্শের দাওয়াত

মোঃ আজিজুর রহমান খান

খান প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল ঃ ০১৭৪০১৯২৪১১।

কালিমা তাইয়িবা
একটি জীবন-আদর্শের দাওয়াত

মোঃ আজিজুর রহমান খান

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ: জুন, ২০১০
দ্বিতীয় প্রকাশ: জুন, ২০১২

খান প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার,
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মূল্য ঃ ৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

KALIMA TAIEBA : AKTI JIBON ADORSHER DAWAT
MD. AZIZUR RAHMAN KHAN
PAB: KHAN PROKASHONI
PRICE: 30.00 TK. 1 DOLAR (US).

ভূমিকা

প্রিয় পাঠক!

আস্ সালামু আলাইকুম। একজন মুসলমান হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে কালিমায় বিশ্বাস স্থাপন করা। কালিমা তাইয়িবা না পড়ে কেউ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না। কালিমায়ে তাইয়িবা হচ্ছে:

لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه

অর্থ: "আল্লাহ ছাড়া আর কোন 'ইলাহ' নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রেরীত রাসূল।" (উল্লেখ্যঃ কালিমার প্রথমাংশ সূরায়ে মুহাম্মাদ এর ১৯ নং আয়াতে এবং শেষাংশ সূরায়ে ফাতহ এর ২৯ নং আয়াতে আছে।)

কিন্তু আজ আমরা এক দিকে যেমন মুখে কালিমা উচ্চারণ করছি, অন্যদিকে আমাদের কাজের দ্বারা কালিমাকে অস্বীকার করছি। একদিকে বলছি আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আবার আমাদের কাজে কর্মে অনেককেই ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করছি। এই অবস্থার মূলে রয়েছে কালিমার প্রকৃত অর্থ ও দাবী সম্পর্কে সঠিক ধারণার অনুপস্থিতি। তাই আজ এ বিষয়গুলোর উপর বাস্তব ভিত্তিক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

কালিমার উপর ভিত্তি করেই একজন মুসলমানের জীবনের সকল আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। কালিমার বিশ্বাস দ্বারাই একজন মুসলমান শিরক থেকে রক্ষা পেতে পারে। যুগ যুগ ধরে নবী ও রাসুল আ. গণ এ কালিমার দাওয়াত দিয়েছেন। আমরা একদিকে কালিমা বলব এবং অন্য দিকে শিরকের মধ্যে লিপ্ত হবো -তা হতে পারে না।

সাহাবাগণ যে মুহুর্তে কালিমার ঘোষণা দিয়ে মুসলমান হয়েছেন সে মুহুর্তে তাদের জীবনের আমুল পরিবর্তন হয়েছিল। আজকের মুসলমানরা কালিমা উচ্চারণ করে কিন্তু তাদের জীবনের কর্মকান্ডের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না। একদিকে কালিমা উচ্চারণ করে, আবার অন্য দিকে বিভিন্নভাবে শিরকী কার্যক্রমেরও সম্পৃক্ত থাকে।

এ কালিমার মধ্যে ইসলামের বিজয়ের বীজ নিহীত আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূলত: এই একটি মাত্র কালিমার বাণী

দিয়ে মক্কার পুরো নেতৃত্বকে মোকাবেলা করেছিলেন। পুরো আরব এবং পর্যায়ক্রমে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় আসন্ন করেছিলেন। কিন্তু আজকের মুসলমানরা কালিমা উচ্চারণ করে তবে কালিমার নেতৃত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়।

কালিমার মূল বিষয় হচ্ছে এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইলাহ মানা যাবে না। তাহলে আমরা বলতে পারি যে একজন মানুষ যখন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইলাহ হিসেবে মান্য করে, তখন সে মূলতঃ কালিমাকে অস্বীকার করে। এ সমাজের মানুষেরা এমন কি সমাজের দৃষ্টিতে অনেক পাকা ঈমানদার মানুষেরাও কিভাবে কালিমাকে অস্বীকার করে চলেছে, তা এ আলোচনায় স্পষ্ট হবে বলে আশা করি। আমি এ পুস্তকে কোন অতি মাত্রার তাত্ত্বিক বিষয় নয়, বরং কালিমার বাস্তব ভিত্তিক আলোচনা ও ব্যাখ্যা তুলে ধরার চেষ্টা করব, ইনশাআল্লাহ।

কালিমার দাওয়াতের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যঃ

ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থার বাস্তবায়নকে সামনে রেখেই মূলতঃ প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালিমার দাওয়াত নিয়েই তৎকালীন সমাজের কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর দাওয়াতী কর্মকান্ডের মধ্যেই এ বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে। নিম্নে এরূপ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো।

অনৈসলামী ব্যবস্থার পরিবর্তনঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কালিমার দাওয়াত নিয়ে সমাজের মধ্যে গেলেন তখন সে সমাজ কালিমাকে একটি ব্যবস্থা হিসেবে বুঝতে পেরেছিলো এবং কালিমার মধ্যে তারা তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অবসান দেখতে পেয়েছিল।

তারা বুঝতে পেরেছিল যে এ কালিমা ভিত্তিক ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে তাদের প্রচলিত ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দাওয়াতের ফলে মক্কার সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় ব্যবস্থাসহ সকল কিছুর পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। মূলতঃ তারা তাদের ব্যবস্থা পরিবর্তন ও আদর্শ পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত ছিল না

এবং এ অবস্থান থেকেই তারা কালিমার বিরোধিতা করেছিল। সে জন্যই তৎকালীন আরব সমাজ থেকে প্রতিবাদসহ নানা রকম জুলুম ও নির্যাতন এসেছে। এ বিরোধিতা কেবলমাত্র কয়েকটি ব্যক্তিগত ইবাদত যেমন নামায, রোজা ইত্যাদির বিরুদ্ধে ছিল না, বরং এটি ছিল একটি আদর্শের (ideology) বিরুদ্ধাচরণ। একটি প্রতিষ্ঠিত জীবন ব্যবস্থার বিরোধিতা।
এজন্যই তৎকালীন মক্কার মুশরিকরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে লক্ষ্য করে বলেছিলো, "হে মুহাম্মাদ! তুমি কি আমাদের বাপ-দাদাদের দ্বীন পরিবর্তন করে ফেলতে চাও?"
মক্কার মুশরিক সমাজ কখনো তাদের ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে প্রস্তুত ছিল না। অথচ কালিমার দাওয়াত ছিল মুশরিকদের পুরো ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে ফেলার এক বিপ্লবী আহ্বান। কিন্তু আজকাল আমাদের সমাজে অনেকেই এমনভাবে কালিমার দাওয়াত দেন তাতে আজকের সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের ঈঙ্গিত থাকে না এবং মুশরিকদের ব্যবস্থার গায়ে কাঁটার আচঁরও লাগে না।

আজকে অনৈসলামিক বিশ্ব এবং সেক্যুলার সমাজ থেকে ইসলামের যে বিরোধিতা করা হয়, তা মূলত: ইসলামী আদর্শ (ideology) ও জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরোধিতা। ব্যক্তিগত কিছু আমল বিরোধিতার বিষয় নয়। আজকেও কেবলমাত্র নামায, রোজা পালন করে, ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধানগুলোকে অবজ্ঞা করে, মডারেট মুসলমান সেজে পশ্চিমাদের আনুকূল্য পাওয়া যায়। কিন্তু যখনই কালিমার পূর্ণাঙ্গ দাওয়াত এবং তা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়, তখনই তৎকালীন সমাজের মতো আজকের পুঁজিবাদী সমাজ এবং সেক্যুলারদের থেকে প্রচন্ড বিরোধিতা আসে। বর্তমানেও এ তাগুতী শক্তি পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র আর ধর্মরিপপেক্ষতার ছদ্মাবরণে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। কালিমার সঠিক দাওয়াত দিতে গেলেই এ তাগুতী শক্তির সাথে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠে।

ইসলামী নেতৃত্ব তৈরি করাঃ

কালিমার দাওয়াতের ফলে মক্কার তৎকালীন নেত্রীবৃন্দ তাদের নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে শংকিত ছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল মুহাম্মাদের ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে তাদের আধিপত্ব ও নেতৃত্বের অবসান হবে। সেজন্য তারা

কালিমার বিরোধিতা করেছিল। কালিমার দাওয়াত যে নেতৃত্বের সাথে সম্পর্কিত ছিল, তার উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায় :
একবার মক্কার কুরাইশ নেতৃবৃন্দ যখন একটি সমঝোতায় আসার জন্য হযরত মুহাম্মদ সা.-এর কাছে এলেন, তখন তিনি বলেছিলেন "কেবলমাত্র একটি কথা মেনে নিলেই তোমরা আরবের নেতৃত্ব পাবে এবং অনারবরা তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করবে।"
এ প্রস্তাবে আবু জাহেল আগ্রহী হয়ে বলল- "কি সে কথা! আমি শপথ করে বলছি এরকম একটি কথা কেন, প্রয়োজনে দশটি কথাও মানতে রাজী আছি"।
তখন তিনি সা. বললেন "বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" এ কথা শুনে কুরাইশরা চলে গেল।

মক্কার লোকেরা এই যে কালিমার বিরোধিতা করেছিলো, এটা কিন্তু তারা জেনে বুঝেই করেছিলো। তারা বুঝতে পেরেছিলো যে এই কালিমা গ্রহণ করলে তাদের মনগড়া আইন-কানুন দ্বারা সমাজ পরিচালনা আর তাদের খেয়াল-খুশি মতো চলার দিন শেষ হয়ে যাবে। এটা এমন এক দাওয়াত যেখানে সকল ইচ্ছা-স্বাধীনতাকে এক আল্লাহর সামনে সমর্পণ করতে বলা হচ্ছে, তাঁর সকল আইন-কানুন মেনে নিতে আহ্বান করা হচ্ছে। তাই তারা বুঝে শুনে কালিমার একত্ববাদ ও আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বিপক্ষে অবস্থান নিলো। আবূ লাহাব আরও বললোঃ

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ.

অর্থ: "তবে কি সে সকল ইলাহগুলোকে এক ইলাহতে কেন্দ্রীভূত করে ফেলল? এতো অত্যন্ত আজব কথা।" (সূরা সোয়াদ, ৩৮ঃ আয়াত ৫)
অর্থাৎ মুহাম্মাদ আমাদের সকল ইলাহকে ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছে। সব ইলাহের স্থলে এক আল্লাহকে বসাতে চাচ্ছে। এটা মানা সম্ভব নয়, কেননা তাহলে আমাদের সকল ক্ষমতা ও স্বেচ্ছাচার বন্ধ হয়ে যাবে।
মূলত: কালিমার এ দাওয়াতের মধ্যেই বিশ্বব্যাপি ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বীজ নিহিত ছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালিমার একটি মাত্র বানী দিয়ে মক্কার মক্কার পুরো নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। ফলে কুরাইশরা তাদের নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে ভীত ছিল। আল্লাহর রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দ্বীন কায়েম করেছিলেন তখন সত্যিকার অর্থেই উম্মাহ্র নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং এ নেতৃত্ব বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

মূলত: কালিমার এ দাওয়াতের মধ্যেই বিশ্বব্যাপি ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বীজ নিহিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সা. কালিমার একটি মাত্র বাণী দিয়ে মক্কার মক্কার পুরো নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। ফলে কুরাইশরা তাদের নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে ভীত ছিল। আল্লাহর রাসূল সা. যখন দ্বীন কায়েম করেছিলেন তখন সত্যিকার অর্থেই উম্মাহর নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং এ নেতৃত্ব বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

◎ আজকে একশ্রেণীর মানুষ এমনভাবে কালিমার দাওয়াত দেন যে তা কেবল তাদের তসবীর দানা গণনা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাতে বিশ্ববাসীকে নেতৃত্ব দেয়ার মতো কোন নির্দেশনা খুঁজে পাওয়া যায় না।

দ্বীনকে বিজয়ী করা:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কালিমার দাওয়াত নিয়ে মক্কার জাহিল সমাজকে একত্ববাদের দিকে আহ্বান জানালেন। যারা ইসলামে আসলেন তারা কালিমার গুরুত্ব বুঝেই ইসলামে আসলেন। বহু ইলাহর পরিবর্তে এক ইলাহর নির্দেশে কিভাবে জীবন পরিচালিত হবে এ বিষয়টি তাদের কাছে পরিস্কার ছিল। তারা পরিস্কার বুঝতে পেরেছিলেন যে বহু ইলাহর পরিবর্তে এক ইলার নির্দেশ অনুসারেই তাদের ইবাদত পরিচালনা করতে হবে। সে ইলাহর নির্দেশ অনুসারেই পরিবার, সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি সব কিছুই পরিচালনা করতে হবে।

মূলত: কালিমার দাওয়াত ছিল এরকম একটি সামগ্রিক বিষয়ের। তাই সাহাবাগণও কালিমার মর্মবাণীর সাথে তাদের সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির পরিস্কার যোগসূত্র দেখতে পেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দারুল আরকামে বসে সাহাবীদের কালিমার দীক্ষা দিচ্ছিলেন তখন এক সাহাবী বলে উঠেছিলেন যে, ইয়া রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটিই যদি কালিমার অর্থ হয় তাহলে এ কালিমা একদিন পৃথিবী জয় করবে। মূলতঃ হয়েছিলও তাই। কালিমার শাসন ব্যবস্থাই অর্ধেক পৃথিবীকে ১৩০০ বছর পর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং অন্য সকল জীবন-ব্যবস্থার উপর বিজয় অর্জন করেছিল। আল্লাহ তা'আলাও পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

অর্থ: "তিনি তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্য জীবন ব্যবস্থা দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে তা সকল জীবন-ব্যবস্থার বিজয় অর্জন করে" (সূরা তাওবা ৯, আয়াত ৩৩। সূরা সফ ৬১, আয়াত ৯। সূরা ফাতহ, আয়াত ২৮)

মূলত: কালিমার দাওয়াতের সাথে ইসলামী ব্যবস্থায় বাস্তবায়ন ও বিজয় অর্জন একটি অবিচ্ছেদ্য বিষয়।

- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কালিমার দাওয়াত ছিল মূলত: ইসলামী ব্যবস্থাকে বিজয়ী করার দাওয়াত। কিন্তু দু:খের বিষয় আজকাল অনেকেই এমনভাবে কালিমার দাওয়াত দেন কিন্তু তার মধ্যে ইসলামকে বিজয়ী করার কোন নির্দেশনা থাকে না।

কালিমা তাইয়িবা, শিরক থেকে মুক্তির আহ্বান:

কালিমা বা তাওহীদের বাণী বুঝতে হলে শিরক সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। তাওহীদ ও শিরক পরস্পর বিপরীত। একদিকে একত্ববাদ; অন্যদিকে শিরক। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

انَّه مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَاْوـــهُ النَّارُ.

অর্থ: "নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানাবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার জায়গা হবে জাহান্নামে।" (সূরা মায়েদা, আয়াত: ৭২)

শিরক হচ্ছে আল্লাহর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও গুণাবলীর সাথে অপর কাউকে সে রকম ক্ষমতা ও গুণাবলীর অধিকারী মনে করা। এমনকি সে ক্ষমতা ও

গুণাবলীর ক্ষুদ্রাংশের মালিকও যদি কাউকে মনে করা হয় তাহলে তা পুরোপুরি শিরক।

তাওহীদ ও শিরকের সংঘর্ষ তিনটি পর্যায়ে:

১) রুবুবিয়্যাত। সৃষ্টিকর্তা ও রব হিসেবে তাওহীদ বা আল্লাহর এককত্ব।

২) উলুহিয়্যাত। ইলাহ হিসেবে তাওহীদ বা আল্লাহর এককত্ত্ব বজায় রাখা।

৩) আসমা ও সিফাত। আল্লাহর নাম এবং গুণাবলীর ক্ষেত্রে তাওহীদ বা আল্লাহর এককত্ব বজায় রাখা।

- এই তিনটি বিষয়ের ক্ষেত্রে সব সময়ই মহান আল্লাহর এককত্ব বজায় রাখতে হবে। এর ব্যতিক্রম করে উপরোক্ত বিষয় গুলোতে মহান আল্লাহর সাথে কাউকে অংশিদার করা হলে তাই হবে শিরক।

প্রথম বিষয়টির অর্থাৎ আল্লাহর রবুবিয়াতের সাথে একমাত্র গুটিকতক নাস্তিক ব্যতীত সাধারণত: কেউ শিরক করে না। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে সবাই আল্লাহকে বিশ্বাস করে। এমনকি তৎকালীন আরবের অধিকাংশ মুশরিকরাও আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করতো। যেমন– উল্লেখ করা যায় যে, ইয়ামানের বাদশা আবরাহা যখন কাবা ঘর ধ্বংস করতে এসেছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর দাদা আবদুল মুত্তালিব কাবা ঘরের দরজা ধরে বলেছিলেন "আল্লাহ এটি তোমার ঘর। তুমি এর হেফাজত কর। তুমি চাইলে কেউ এর ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।" এ থেকে দেখা যায় যে, সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহর প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও পবিত্র কুরআনে তাদের মুশরিক হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মান্য করলেও, আল্লাহর রবুবিয়াতের সাথে শিরক না করলেও, কিন্তু তারা আল্লাহর উলুহিয়্যাত ও সিফাতের সাথে শিরকে লিপ্ত ছিল।

আজকের সমাজের মানুষেরা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মান্য করে কিন্তু অনেকেই আল্লাহর উলুহিয়্যাত ও সিফাতের সাথে শিরকে লিপ্ত রয়েছে। আমরা জানি আল্লাহ তা'আলার শতাধিক গুণবাচক নাম রয়েছে। এগুলো হচ্ছে আল্লাহর সিফাত। যেমন আল্লাহ তা'আলা আইনদাতা, রিজিকদাতা, সাহায্যকর্তা, পালনকর্তা। এগুলোর সাথে কোন রকম অংশিদার করলে

এগুলোকে বলা হয় সিফাত বা উলুহিয়াতের সাথে শিরকে লিপ্ত হওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বিষয়টি এভাবে বর্ননা করেছেন।

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ

অর্থ: "অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে শিরক ও করে।" (সুরা ইউসুফ, আয়াত ১০৬)

কালিমা তাইয়িবায় মূলত: সকল প্রকার শিরক থেকে মানব জাতীকে মুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। কালিমা তাইয়িবা বিশ্বাস করলে কোন প্রকার শিরকের সাথে যুক্ত হওয়া যাবে না।

কালিমা তাইয়িবার নামকরণ:

কালিমা শব্দের অর্থ বাক্য, কথা বা বাণী এবং তাইয়িবা শব্দের অর্থ পবিত্র। তাই কলিমা তাইয়িবার অর্থ দাঁড়াচ্ছে পবিত্র বাণী। এ বাণী মেনে নেয়ার মাধ্যমেই শিরক থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ পবিত্র জীবনে প্রবেশ করতে পারে তাই এর নামকরণ করা হয়েছে পবিত্র বাণী।

কালিমা তাইয়িবার বিশ্লেষণ:

কালিমা তাইয়িবার দুটি অংশ রয়েছে। প্রথমত: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং দ্বিতীয়ত: مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰه মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্। প্রথম অংশের অর্থ হচ্ছে - আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই এবং দ্বিতীয় অংশের অর্থ হচ্ছে- মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। এ কালিমার প্রথম অংশে শিরকের অন্ধকার থেকে মানব জাতিকে একত্ববাদের দিকে আহ্বান জানানো হয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক ও উত্তম আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রথম অংশ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মূল শিক্ষা হচ্ছে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন শক্তিকে ইলাহ্ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। কালিমা মান্য করার মানে হচ্ছে অন্য সকল ইলাহর শিকড় উপড়ে ফেলা। আল্লাহ্ ছাড়া বিভিন্ন শক্তিকে ইলাহ্

হিসেবে মান্য করা হলে, কালিমা অস্বীকার করা বুঝাবে। কারণ কালিমা তাইয়িবা হচ্ছে জীবনের অন্য সকল ইলাহ্কে অস্বীকার করার এক বিপ্লবী ঘোষণা।

ইলাহ্ কাকে বলে:

কালিমা তাইয়িবার প্রথমাংশ সঠিকভাবে বুঝতে হলে এবং এর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে হলে ইলাহ্ সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা থাকতে হবে। আরবীতে উলুহিয়াত শব্দের অর্থ হচ্ছে সার্বভৌমত্ব। আর যিনি এ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তাকে বলা হয় ইলাহ। ইলাহ বলতে বুঝায় এমন কোন শক্তি যার কাছে মানুষ নিজেকে সমর্পন করে এবং যার অনুসরণ করে।
ইলাহ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- যার কাছে আশ্রয় নেয়া যায়, যার কাছে যাবতীয় আশা আকাঙ্খা পূরণের নিবেদন করা যায়, যার ইবাদাত বন্দেগী করা যায়।
অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র ইবাদাত ও পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য পাওয়ার উপযুক্ত। আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারো ইবাদাত ও আনুগত্য করলে তাকে ইলাহ্ হিসেবে মান্য করা বুঝাবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর উলুহিয়াতের সাথে শিরক করা হবে।
আল্লাহ্ তা'আলার উপর বিশ্বাস, তার অস্তিত্ব, তিনি সৃষ্টিকর্তা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, আইনদাতা এগুলো রুবুবিয়াতের পর্যায়ে পরে। এসকল বিষয়ের সমতুল্য কাউকে মনে করা হলে তাকে রব হিসেবে মান্য করা বুঝাবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর রুবুবিয়াতের সাথে শিরক করা হবে।

আল্লাহ্ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট কিছু 'আসমা' বা গুনবাচক নাম এবং 'সিফাত' বা গুনাবলী আছে। যেমন আল্লাহ তায়াল আইনদাতা, পালন কর্তা, সাহায্যকর্তা, রিজিকদাতা ইত্যাদি। কাউকে এ সকল নাম এবং গুনাবলীর সমতুল্য মনে করা যাবে না। এ সিফাতের সাথে কাউকে অংশিদার মনে করলে তাকে 'আসমা ও সিফাতে'র ক্ষেত্রে মান্যকরা বুঝাবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর 'আসমা ও সিফাতে'র সাথে শিরক করা হবে।
পবিত্র কুরআনে যে সকল ইলাহ'র ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

নফসকে ইলাহ্ মান্য করা:

এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা নিজের নফসকে ইলাহ্ হিসেবে মান্য করছে। পাঠকের হয়তো মনে হতে পারে যে নিজের নফস্ কিভাবে ইলাহ্ হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন-

اَ رَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلـــهَه هَوــهُ.

অর্থ: "আপনি কি তাদের দেখেছেন যে নিজের প্রবৃত্তিকে ইলাহ্ বানিয়ে নিয়েছে" (সুরা ফুরকান, আয়াত: ৪৩)

এ আয়াতে ইলাহ্ বলতে নিজের নফস বা নিজের ইচ্ছা শক্তিকে বুঝানো হয়েছে। নফসকে ইলাহ বানানোর অর্থ হচ্ছে নফসের দাসত্ব করা। মূলতঃ আল্লাহর আদেশকে অমান্য করে নিজেদের কামনা-বাসনা অনুযায়ী কাজ করার অর্থই হচ্ছে নফসকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা। অর্থাৎ প্রবৃত্তির তাড়নায় আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করা বুঝায়।

মূর্তি পূজা করা কিংবা অন্য কোন কাউকে ইলাহ্ হিসেবে মান্য করলে যেভাবে শিরক হবে, নফসের দাসত্ব করা হলে তাও একই রকম শিরক হবে। হযরত আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

"আসমানের নিচে আল্লাহ্ ছাড়া আর যত মাবুদের পূঁজা করা হয়, তন্মধ্যে আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট মাবুদ হচ্ছে নফসের খাহেশ যা অনুসরণ করা।"

বর্তমান সমাজে এরূপ লোকের সংখ্যাই বেশি, যারা নিজের কামনা বাসনার গোলাম হয়ে হক এবং বাতিলের কোন পার্থক্য করে না, ন্যায় অন্যায়ের কোন তোয়াক্কা করে না। এ সকল মানুষ নিজের খেয়ালের বশবর্তী হয়ে অবলীলায় আল্লাহর হুকুমকে অমান্য করে। কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে অবজ্ঞাও করে। এভাবেই এসকল লোকেরা নফসকে ইলাহের আসনে অধিষ্ঠিত করে।

একজন ব্যক্তি যখন আল্লাহর কোন নির্দেশের বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছা শক্তিকে প্রাধান্য দেয় তখন তার নফস ইলাহর পর্যায়ে চলে যায়। যেমন আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে - সূদের লেনদেন করো না, ঘুষ নিও না, ওজনে কম দিও না, মজুতদারী করো না, ভেজাল দিও না, কিংবা যিনার কাছে যেও না। কিন্তু নফসের লোভ সামলাতে না পেরে মানুষেরা এ কাজগুলো করে। এ সকল

অন্যায়গুলো করার জন্য নফস্ মানুষকে প্রলুব্ধ করে থাকে। তখন নফস ইলাহর পর্যায়ে পরে।
যেমন, একজন কর্মচারীকে ঘুষ গ্রহণ করার জন্য নফ্স তাকে ভিতরে ভিতরে অভাবের যুক্তি দাঁড় করায় কিংবা উন্নত জীবনের মোহ দেখায়। অত:পর সে যখন কাজটি করে, তখন সে প্রবৃত্তি বা নফসকে আল্লাহর নিষেধের চেয়েও বেশি গুরুত্ব প্রদান করে এবং এভাবে নফসকে ইলাহর আসনে বসায় এবং এ কর্মের দ্বারা কালিমাকে অস্বীকার করে। এমনিভাবে নফস্, জীবনকে অন্যায়ভাবে উপভোগ করার চাহিদা দাঁড় করিয়ে কোন ব্যক্তিকে যিনায় প্রলুব্ধ করে এবং কোন ব্যক্তি যখন এ কাজটি করে তখন সে আল্লাহর হুকুমের চেয়েও নিজের নফসকে বিশি গুরুত্ব প্রদান করে। ফলে তার নফস ইলাহের আসনে পর্যবশিত হয়। এভাবে সে নফসকে ইলাহ বানিয়ে কালিমাকে অস্বীকার করে।

এভাবে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে নফসের তারণায় মানুষ যখন আল্লাহর কোন হুকুমকে অমান্য করে, তখন নফস্ তাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং আল্লাহর হুকুমের চেয়ে নিজের নফসকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে। তখন নফস ইলাহর পর্যায়ে উপনীত হয়। ফলে সে শিরকের মধ্যে লিপ্ত হলো।
কিংবা এক শেণীর শাসকরা যখন আল্লাহর বিধানের তোয়াক্কা না করে নিজের খেয়াল খুশি অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করে। তখন তাদের নফস ইলাহর পর্যায়ে পরে। কারণ তারা এ ক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমের চেয়ে নিজের নফস্কে বেশি প্রধান্য দেয়। তখন তারা কালিমাকে অস্বীকার করল এবং শিরকের মধ্যে লিপ্ত হলো।
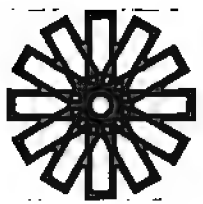
শিক্ষনীয়ঃ নিজের খেয়ালের বশবর্তী হয়ে আল্লাহর কোন হুকুম অমান্য করার মাধ্যমে নিজের নফ্সকে ইলাহ বানানো হয় এবং 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই' কালিমার এ বাণীকে কর্ম দ্বারা অস্বীকার করা হয়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি কালিমার ঘোষণা থেকে সরে দাঁড়ায় ও আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত হয়। তাই এ অবস্থা থেকে আমাদের সব সময় বেঁচে থাকতে হবে।

ফকীর দরবেশদেরকে ইলাহ্ মান্য করা:

মানুষ কখনো কখনো তাদের পুরোহিত, ধর্মযাজক বা সাধু সন্যাসীদের ইলাহ্ হিসেবে মান্য করে। ইহুদী-খৃষ্টানরা আল্লাহর কিতাবের চেয়ে আলেম দরবেশের কথাকে বেশী গুরুত্ব দিত। তাদেরকে শরীয়াহ (আইন) প্রণেতা মনে করতো। আল্লাহর বাণীর চেয়ে তারা তাদের পাদ্রী-পুরোহিত বা পীর-দরবেশদের কথার বেশী আনুগত্য করতো। তাদের কথাকে শরীয়ার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দিত। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.

অর্থ: "তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারয়ামপুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যেই আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ছাড়া কোন (হক) ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তিনি তা থেকে পবিত্র।" (সূরা তাওবা ৯, আয়াত ৩১)

এটি খুবই গুরুতর একটি ব্যাপার। তাই যখন পবিত্র কুরআনের সূরায়ে তাওবার উপরোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন সাহাবীগণ সরাসরি বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে পরিষ্কার করে নিয়েছেন। সহীহ হাদীসের মাঝে ইরশাদ হয়েছে:

عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي صلى الله عليه و سلم سمعته يقرأ في سورة براءة {اتخذوا أحبارهم...} قال أما إنهم لم يكونوا يعبدوهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. (سنن الترمذي)

অর্থ: "হযরত আদী ইবনে হাতেম রা. বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে দেখলাম তিনি সূরা তওবার এই আয়াতটি তেলাওয়াত করছিলেন: "তারা তাদের সন্ন্যাসী ও ধর্মযাজক (পীর, নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে) আল্লাহর পরিবর্তে 'রব' বানিয়ে নিয়েছে।" (সূরা তওবা ৯, আয়াত ৩১)

আদী রা. বলেন, আহলে কিতাবরা (ইহুদী ও খৃষ্টানরা) তো আলেম/ দরবেশদের (তথা নেতাদের) রব হিসেবে গ্রহণ করতো না, তাদের ইবাদত করতো না!
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, তা সত্য। তবে তারা মন মতো কোনো কিছুকে বৈধ কিংবা অবৈধ ঘোষণা করলে জনগণ তা নির্বিচারে মেনে নিতো। (বৈধ-অবৈধ ঘোষণার কর্তৃত্ব নেতাদের হাতে তুলে দেয়ার অর্থই হচ্ছে তাদেরকে রবের আসনে বসানো) এটাই তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করা, তাদের পূজা-উপাসনা/ইবাদত করা।" (তিরমিযী)

এক শ্রেণীর মানুষ মনে করে সরাসরি আল্লাহর নিকট পৌঁছা যায় না। আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হলে পীর, দরবেশ, বুজুর্গের নিকট মুরীদ হয়ে কিংবা মাজারে হাজির হয়ে ফায়েজ হাসিল করতে হবে। আল্লাহর নিকট পৌঁছাতে হলে এদেরকে মাধ্যম হিসেবে ধরতে হবে। এ শ্রেণীর মানুষেরা শরীয়াহর নিয়ম-কানুনের চেয়ে ফকীর-দরবেশ বা পীর-মুরশিদদের কথাকে বেশী গুরুত্ব দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

অর্থ: "জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্রই জন্য নির্দিষ্ট। যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে তারা বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ্র নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফায়সালা করে দেবেন। আল্লাহ্ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (সূরা যুমার, ৩৯ঃ আয়াত ৩)

এ শ্রেণীর মানুষরা পীর-দরবেশ যা বলে তা শরীয়াতের পরিপন্থী হলেও তাদের কথাকে মান্য করে। তারা বিভিন্ন রকম বিদ'আত কর্মকান্ড করছে। মাজারে গমন করে মানত করছে। এক শ্রেণীর মহিলারা বেপর্দাভাবে ফকীর-দরবেশ বা তথাকথিত বাবার দরবারে যাতায়াত করছে। এ বাবারা যা বৈধ বা অবৈধ সাব্যস্ত করে দেয়, তারা সেভাবে তা মান্য করে। এরকম

বাবা বা অন্য কারো রূহানী শক্তির নিকট কোন কিছু আশা করা পরিস্কার শিরক।
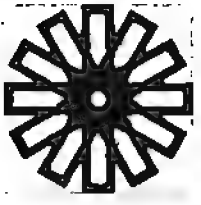
শিক্ষনীয়: যারা শরীয়তের চেয়ে পীর-ফকীর ও ধর্মীয় কোনো পন্ডিত ব্যক্তির কথাকে বেশী গুরুত্ব প্রদান করলো, তারা এ রকম কর্মকান্ড দ্বারা পীর-দরবেশদেরকে ইলাহ্ হিসেবে মান্য করলো এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই, কালিমার এ বাণীকে তারা কর্ম দ্বারা অস্বীকার করলো এবং কালিমার ঘোষণা থেকে সরে দাঁড়ালো ও আল্লাহর সাথে শিরক করলো।

রিজিক-দাতা ইলাহ্ ও সাহায্যকারী ইলাহ্ :

মানুষের রিজিকের ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর হতে। তাই রিজিকের জন্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছে মুখাপেক্ষী হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা যত প্রাণীকুল তৈরি করেছেন তার সকলে রিজিকের ফয়সালা তিনি করেছেন। তাই রিজিকদাতা হিসেবে একমাত্র আল্লাহকেই মানতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন আয়াতে বলেছেন-

اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ.

অর্থ: "আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর রিযিক দিয়েছেন।" (সূরা রূম ৩০, আয়াত ৪০) অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.

অর্থ: "আর যমীনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিয্কের দায়িত্ব আল্লাহরই এবং তিনি জানেন তাদের আবাসস্থল ও সমাধিস্থল। সব কিছু আছে স্পষ্ট কিতাবে।" (সূরা হুদ, আয়াত ৬)

এছাড়াও আরো বিভিন্ন আয়াতে রিজিকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মানুষরা কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার কাছেই রিজিক প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য যে রিজিক বরাদ্ধ রেখেছেন তাই কেবলমাত্র সে উপার্জন করতে পারে। মানুষরা কেবলমাত্র নির্ধারিত রিজিক উপার্জন করার পদ্ধতি নির্বাচন করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পদ্ধতি নির্বাচন করার স্বাধীন ইচ্ছে শক্তি দিয়েছেন।

কোন একজন মানুষ চাকুরি করে তার নির্ধারিত রিজিক উপার্জন করতে পারে, কিংবা ব্যবসা করে উপার্জন করতে পারে কিংবা ছিনতাই করেও উপার্জন করতে পারে কিংবা অন্য কোন উপায় নির্বাচন করতে পারে। মানুষ রিজিক উপার্জন করার যে পদ্ধতিই নির্বাচন করুক না কেন, সে কেবলমাত্র তার জন্য বরাদ্ধকৃত রিজিক থেকেই তা গ্রহণ করে।

এ আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে রিজিক প্রার্থনা করা যাবে না, এরকম করলে তাকে রিজিকদাতা ইলাহ মান্য করা বুঝাবে।

মানুষ যখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন সত্ত্বার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে তখন তাকে সাহায্যকারী ইলাহ্ বুঝায়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ اٰلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ.

অর্থ: "তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে ইলাহ্ বানিয়েছে, যাতে করে তারা তাদের কাছ থেকে সাহায্য পায়।" (সূরা ইয়া সীন, আয়াত: ৭৪)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে তাকে ইলাহ মান্য করা বুঝায়।

বাস্তব জীবনে এরকম অনেক ইলাহ্ দেখতে পাওয়া যায়। প্রায়ই দেখা যায় যে বিদেশী সাহায্য সংস্থাগুলো আর্থিক সাহায্যের নামে উদ্দেশ্যমূলকভাবে অনৈসলামী শর্ত জুড়ে দেয়। আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাও প্রায়ই এ সকল সাহায্যের লোভে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে।

যেমন এ দেশের মেয়েদের দিয়ে ফুটবল না খেলালে এ খাতে ফিফা কোন সাহায্য করবে না বলে শর্ত দিয়েছিল। ২০০5 সালে তৎকালীন সরকার সাহায্যের লোভে আমাদের মেয়েদেরকে দিয়ে প্রমিলা ফুটবল খেলাও চালু করেছিল। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আইএমএফ ও এনজিওরা আমাদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করা ও দূরে সরিয়ে দেয়অর জন্য ক্রমাগতভাবে সাহায্যের সাথে এরকম বিভিন্ন অনৈসলামিক শর্ত জুড়ে দেয়। এনজিরা কৌশলে আমাদের মেয়েদের বেপর্দা করার জন্য অর্থনৈতিক সহায়তার আশ্বাস দেয়।

আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে হলেও এমন শর্ত মেনে নিয়ে যারা এরকম সাহায্য গ্রহণ করে তারা মূলতঃ তাদেরকে সাহায্যকারী ইলাহ হিসেবে মান্য করে ফেলে।
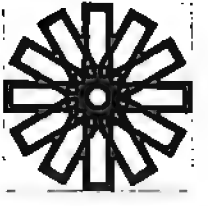
শিক্ষনীয় যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কোন শর্তকে মেনে নিয়ে এভাবে কোন সাহায্য গ্রহণ করে তারা ওই সকল সাহায্যকারীকে ইলাহ্ হিসেবে মান্য করল এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নাই, কালিমার এ বাণীকে তারা কর্ম দ্বারা অস্বীকার করলো এবং কালিমার ঘোষণা থেকে সরে দাঁড়ালো ও আল্লাহর সাথে শিরকের মধ্যে লিপ্ত হলো।

রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে আইনদাতা ইলাহ্ মান্য করা :

ইসলামে আইন প্রনয়ন কারার ক্ষমতা এক মাত্র আল্লাহতায়ালার হাতে। এটি আল্লাহ্ তায়ালার সিফাতের একটি অংশ। ইসলামে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা মানুষকে দেয়া হয় নাই। মানুষ যদি কখনো এ ক্ষমতা নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী অনুশীলন করে তাহলে সে আল্লাহ তায়ালার সিফাতের সাথে শিরক করে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

অর্থ: "আল্লাহ ছাড়া আর কারো বিধান দেয়ার ক্ষমতা নেই।" (সূরা ইউসূফ ১২, আয়াত ৪০। সূরা কাসাস ২৮, আয়াত ৬৯-৮৮)

মুসলমানদের সকল আইন-কানুন কুরআন ও হাদীস থেকে গ্রহণ করতে হবে এবং যে আইন-কানুন সুস্পষ্ঠভাবে উল্লেখ নেই তা শরীঅতের নীতি অনুযায়ী ইজতিহাদ করে বের করে নেবে। অন্যকোন উৎস থেকে আইন-কানুন গ্রহণ করা যাবে না। কারণ উপরোক্ত আয়াত হতে প্রমাণিত যে আইনদাতা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা। তাই অন্য কোন উৎস থেকে আইন-কানুন গ্রহণ করলে তাকে ইলাহ মানা হবে এবং প্রকারান্তে কালিমাকে অস্বীকার করা হবে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে মানুষের আইনদাতা ইলাহ হতে পারে তা আজকের মুসলমানরা প্রায় ভুলেই গেছেন। এ বিষয়টি আজকে উপলব্ধি করা বেশী জরুরী। এ প্রসংগে পবিত্র কুরআন থেকে ফেরাউনের উদাহরণ উদ্বৃত করা যায়।

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يَا اَيُّهَا الْمَلأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ.

অর্থ: "ফেরাউন বলল, হে পরিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ আছে বলে আমার জানা নাই।" (সুরা কাসাস, আয়াত ৩৮)

উপরোক্ত আয়াতে ফেরাউন নিজেকে ইলাহ হিসেবে দাবী করেছে। এ কথার অর্থ এ নয় যে সে বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা বা আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করার দাবী করে ছিল। কিংবা এ কথার অর্থ এটাও নয় যে সে আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করতো না। ফেরাউন তার আইন দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতো। এ হতে এটা প্রমাণীত হয়, আল্লাহর কিতাবের হালাল-হারামের মাপকাঠি বাদ দিয়ে যারা আইন প্রণয়ন করে তারা অইনদাতা ইলাহ হিসেবে পর্যবশিত হয়। ফেরাউন এ কাজটিই করেছিল। তৎকালীন সময়ের ফেরাউনরাও আল্লাহকে স্বীকার করতো কিন্তু নিজেরা আইন প্রণয়ন করার ভুমিকা পালন করতো। আমরা যেন ফেরাউনদের মতো কোন শাসকদের মেনে না নেই, সেজন্যই আলাহ তায়ালা আমাদেরকে পবিত্র কুরআনে উপরোক্ত আয়াতের দ্বারা সতর্ক করেছেন। ফেরাউনের বিভিন্ন ঘটনা থেকে আমাদর শিক্ষা নেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা বার বার ফেরউনের কথা উল্লেখ কেরছেন। পবিত্র কুরআনে ৭৮ বার ফেরাউন শব্দটি এসেছে। আমরা যেন ফেরাউনদের মতো কোন শাসকদের মেনে নিয়ে শিরকের মধ্যে লিপ্ত না হই। মুসলমান কর্তৃক এ অসৈলামিক শাসকদের মেনে নিলে তা নব্য ফেরাউনকে মান্য করা বুঝাবে। সে জন্যই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে আমাদের সামনে ফেরাউনের কাহিনী শুনিয়েছেন।

ফেরাউনরূপী শাসকদের হুকুম কোন ভাবেই মেনে নেয়া যাবে না। এ বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা অপর একটি আয়াতে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন-

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ.

অর্থ: "আমি আর ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে মূসা (আঃ) কে প্রেরণ করি আমার নিদর্শনাদি ও সুস্পষ্ট সনদসহ, তবুও তারা ফেরাউনের

বিধিবিধানে চলতে থাকে, অথচ ফেরাউনের হুকুম সত্যপন্থি ছিল না। (সূরা হুদ ১১, আয়াত ৯৬-৯৭)

এখানে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন তিনি মুসা (আঃ) ফেরাউন ও তার পরিষদ বর্গের কাছে প্রেরণ করেছিলিন। তার পরেও লোকেরা মুসা (আঃ)-এর কথা না শুনে ফেরাউনের হুকুম বা তার বিধিবিধান অনুসারে চলতে ছিল। কিন্তু ফেরাউন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। সে সত্যকে বাদ দিয়ে নিজের বিধি বিধান দ্বারাই লোকদের পরিচালনা করছেল। তাই ফেরউনের বিধি-বিধান কোনভাবেই মেনে নেয়া যাবে না। সেটাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন যে "তবুও তারা ফেরাউনের হুকুম অনুসারে চলতে থাকে।" অর্থাৎ যারা সত্যকে বাদ দিয়ে নিজেদের বিধি-বিধান দ্বারা পরিচালনা করে তাদের হুকুম মানা যাবে না তাই এ আয়াতে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

আজকে সমাজে বা রাষ্ট্রে যারা কুরআন সুন্নাহকে বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিজেদের ইচ্ছেমতো আইন প্রণয়ন করে এবং তা মানুষদের মানতে বাধ্য করে তারাও মূলতঃ ফেরাউনের মতো ভূমিকা পালন করে। আজকের শাসক শ্রেণীও আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসাবে স্বীকার করে এবং নিজেরা আইন প্রণয়নকরীর ভুমিকা পালন করে। ফেরাউনকে মান্য করলে আল্লাহর সাথে শির্ক করা হতো। তৎকালীন ফেরাউন এবং আজকের আইন প্রনয়নকারী শাসকশ্রেণীর মধ্যে ইসলামের দৃষ্টিতে তেমন কোন পার্থক্য নেই। আজকে যারা আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে সংসদে বসে নিজেদের তৈরি করা আইন মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়, তারা প্রকারান্তে ফেরাউনের ভুমিকা পালন করছে। এদেরকে সমর্থন করা বা মেনে নেয়ার মানে হচ্ছে ফেরাউনকে মান্য করার নামান্তর এবং সরাসরি শির্কে অংশ গ্রহণ করা। মুসলমান কর্তৃক এ অনৈসলামিক শাসকদের মেনে নিলে তা নব্য ফেরাউনকে মান্য করা বুঝাবে।

আজকের নব্য ফেরাউনদের অনুসরণ করে মুসলমানরা যাতে আবার শিরকের মধ্যে হাবুডুবু না খায় তা থেকে সতর্ক করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনের কাহিনী আমাদের কাছে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন যে এ নব্য ফেরাউনদেরকে মান্য করলে তা স্পষ্ট শিরক হবে।

◎ ফিরাউন একজন বাদশা যা আজকের সরকার প্রধান বা রাস্ট্র প্রধান। তৎকালীন সময়ের ফেরাউনরাও আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকার করেতো আজকের গণতান্ত্রিক নামধারী শাসকশ্রেণী আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে স্বীকার করে।

◎ ফেরাউন আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করে নিজের হুকুম দ্বারা জনগণকে পরিচালনা করতো। আজকের গণতান্ত্রিক শাসকশ্রেণীও আল্লাহর হুকুমকে পাশ কাটিয়ে নিজেরা আইন প্রনয়ণ করে এবং তা দ্বারা জনগণকে পরিচালনা করে।

◎ ফেরাউন আইন প্রণয়ন করার ফলে যদি আল্লাহর সিফাতের সাথে শিরক হয়ে থাকে, তাহলে আজকের গণতান্ত্রিক শাসক শ্রেণীর আইন প্রনয়ণ করার ফলেও আল্লাহর সিফাতের সাথে শিরক হবে।

বর্তমান সমাজের মুসলমানগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ইসলাম বিরোধী নব্য ফেরাউনদের মেনে নিয়ে এক মারাত্মক শিরকের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছেন। ফেরাউনকে মেনে নিলে যদি ইলাহ মানা হয় তাহলে আজকের অনৈসলামী রাজা-বাদশা, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এদের মান্য করলেও ইলাহ মানা হবে। ফেরাউনকে মেনে নিলে যদি শিরক করা হয়, তাহলে আজকের এসকল অনৈসলামী শাসকদের মেনে নিলে শিরক করা হবে।

মুসলমানদের জীবন-ব্যবস্থা আইন-কানুন সকল কিছুই কুরআন সুন্নাহ থেকে গ্রহণ করতে হবে। মুসলমানরা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে না কিংবা অন্য কোন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য কাজ করতে পারবে না কিংবা অন্য কোন ব্যবস্থার দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করতেও পারবে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্য একমাত্র ইসলামী ব্যবস্থাই মনোনীত করেছেন। ইসলাম ব্যতীত অন্য সকল কিছুই বাতিল বা অজ্ঞতা বা জাহিল। কোন মুসলমান কোন জাহিল ব্যবস্থার দিকে কোন মানুষকে আহ্বান করতে কিংবা গ্রহণ করতে পারবে না। রাসূল্লাহ সা. বলেন-

"আর যে লোক জাহেলী মতবাদ আর আদর্শের দিকে লোকদের আহ্বান করলো, সে জাহান্নামী। যদিও সে রোজা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজকে মুসলমান হিসেবে দাবী করে।" (-তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ)
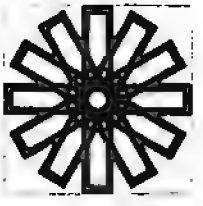
কোন অনৈসলামিক শাসক যারা যারা হালাল-হারামের মাপকাঠি বাদ দিয়ে আইন প্রনয়ণ করে তা ফেরাউনী ব্যবস্থার শামীল। তাদের মেনে নিলে আইন প্রণেতা ইলাহ মান্য করা হবে এবং তা আল্লাহর সাথে শিরক হবে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলা নেই, কালিমার এ বাণীকে কর্ম দ্বারা অস্বীকার করা হবে। তাই এ সকল নব্য ফেরাউনদের কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা এবং উৎখাত করা এবং ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করাই হচ্ছে কালিমার দাবী।

রাস্ট্র ব্যবস্থা যখন রব :

ফেরাউন একজন রাস্ট্র প্রধান। সে নিজেও সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহকে বিশ্বাস করতো। কিন্তু সে নিজের রাস্ট্রের সার্বভৌমত্ব দাবী করার ফলে রব সেজে বসল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে ফেরাউনের সার্বভৌমত্বের কথা নিম্নোক্তভাবে বলেছেন।

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ.

অর্থ: "ফেরাউন তার জাতীর উদ্দেশ্যে এক ভাষণ দিল। সে বলল, হে লোকেরা, মিসরের স্বার্বভৌমত্ব কি আমার নয়? তোমরা কি দেখছ না যে, এ নদীগুলো আমার (রাজত্বের) অধীনেই বয়ে চলেছে।" (সুরা যুখরুফ ৪৩, আয়াত ৫১)।

উপরোক্ত আয়াতের আলোকে বাস্তবতা চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ফেরাউন সার্বভৌমত্বের দাবী করেছে। যেহেতু আসমান জমিনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে তা আমাদের কাছে বিভিন্ন আয়াতে একাধিক বার ঘোষণা করেছেন। এ সার্বভৌমত্ব কোন রাজা, বাদশা, প্রধানমন্ত্রী, রাস্ট্র প্রধান, কোন গোষ্ঠী বা কোন ব্যবস্থা দাবী করলে সে রবের আসনে অধিষ্ঠিত হয়। ফেরাউন সার্বভৌমত্ব দাবী করেছে বলেই রবের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। অপর এক আয়াতে এ কথা আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাবে বলেছেন।

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

অর্থ: "সে সকলকে সমবেত করল এবং সজোরে ঘোষণা করল, এবং বললঃ আমিই হচ্ছি শ্রেষ্ঠ রব।" [সুরা নাজিয়াতঃ ২৩-২৪]।

এ আয়াতে দেখা যায় ফেরাউন সরাসরি নিজেকে রব দাবী করেছে। এ রব দাবী করার অর্থ হচ্ছে, সে তার রাজ্যের সার্বভৌমত্বের অধিকার রাখে। এ জন্যই সে নিজেকে রব হিসেবে দাবী করে ছিল।
কুরআনে এ সকল আয়াত ফেরাউনের কাহিনী আমাদের নিকট পেশ করার কারণ আমরা যেন এমন কোন রাজা বাদশাকে বা কোন ব্যবস্থাকে না মানি যারা সার্বভৌমত্বের দাবী করে বসে। কারণ আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়োর মানে হচ্ছে তাকে রব বলে স্বীকার করে নেয়া হবে।
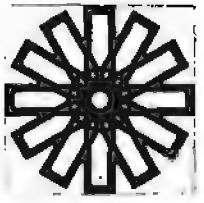
এবারে যে ব্যবস্থা দ্বারা আমাদের শাসন করা হচ্ছে সে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা যাক। গণতন্ত্র বলতে জনগণের শাসন ব্যবস্থা, জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা অর্থে বুঝানে হয়। জনগণ নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা তৈরি করে, ক্ষমতার অনুশীলন করে, আইন রচনা করে, তারা শাসক নির্বাচন করে, নিজেদের কর্তৃক নির্বাচিত শাসকদের মাধ্যমে তাদের প্রণীত ব্যবস্থা ও আইন বাস্তবায়ন করে। অর্থাৎ জনগণ নিজেরা নিজেদের শাসন করে, ব্যবস্থা প্রণয়ন করে এবং আইন রচনা করে, যে আইন দ্বারা তাদের শাসন করা হবে। তারা প্রতিনিধির মাধ্যমে আইন প্রণয়নে অংশ গ্রহণ করে। এভাবে তারা সংবিধান প্রণয়ন করা কিংবা সংবিধান সংশোধন বা বাতিল করতে পারে। ফলে জণগনই সকল ক্ষমতার উৎস। জনগণই সার্বভৌমত্ব ক্ষমতা ধারণ করে এবং জনগণই তাদের সার্বভৌমত্ব চর্চা করতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ হয়ে দাঁড়ায় সার্বভৌমত্বের প্রতীক এবং সকল ক্ষমতার উৎস। এ ব্যবস্থায় জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিকানা দাবী করে। ফেরাউন সার্বভৌম ক্ষমতা দাবী করার ফলে সে আল্লাহর দৃষ্টিতে রব হয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যস্থায় জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার দাবী করার ফলে সে নিজেই নিজের রব হয়ে বসে। অর্থাৎ জনগণই এ ব্যবস্থার প্রভু।

ফেরাউনকে মানলে যদি শিরক হয় তাহলে এ গণতন্ত্র মানলেও শিরক হবে।

কারণ ইসলামে সার্বভৌম ক্ষমতা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার। যারা মুসলমান থাকতে চায় তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত ব্যবস্থা আন্তরিকতার সাথে এবং পুরোপুরিভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে গ্রহণ করতে হবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ফরজ করেছেন। তিনি বিভিন্ন আয়াতে বলেছেন-

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَٰمُ

অর্থঃ "ইসলামই আমার কাছে একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা।" (আল ইমরানঃ ১৯)

উপরোক্ত আয়াত থেকে দেখা যায় যে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জন্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ফরজ করেছেন। এভাবে ইসলামকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা বলে ঘোষণা করা এবং ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ব্যবস্থা ও মতবাদকে মুসলিমদের জন্য হারাম সাব্যস্ত করেছেন। গণতন্ত্রে সাথে ইসলামে ব্যাপক আকীদাগত পার্থক্য রয়েছে। একটি মেনে নিলে অপরটি আপনা আপনিই বাতিল হয়ে যেতে বাধ্য। কোনো অবস্থাতেই উভয়টির সংমিশ্রণ হতে পারে না। হয়তো ইসলাম, অথবা গণতন্ত্র।

তাহলে দেখা যায় যে কালিমা মানতে হলে মুসলমানদের জন্য এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা দরকার যা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে। মুসলমানদের জন্য এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা দরকার যারা জনগণকে কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালনা করবে এবং তা মানতে বাধ্য করবে। আল্লাহর হুকুম কেবলমাত্র ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক অন্য কোন নিজেদের ইচ্ছেমতো পরিচালনা করবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর বিধিবিধানকে পুরোপুরি বাস্তাবায়ন করে মানুষকে শিরক থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তাই কালিমা মানতে হলে আল্লাহ তায়ালাকে রব মানতে হবে এবং তার জন্য ইসলামী রাস্ট্র ব্যবস্থা বা খিলাফত রাস্ট্র ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক।
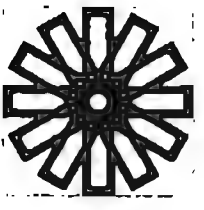
সার্বভৌমত্ব সরাসরি ইসলামী রাস্ট্র ব্যবস্থা জড়িত। কালিমা মানতে হলে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কায়েম করতে হবে। কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী রাস্ট্র পরিচালনা করা হবে এবং এ জন্য ইসলামী রাস্ট্র ব্যবস্থা বা খিলাফত রাস্ট্র ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বাদ দিয়ে জনগণের সার্বভৌমত্ব কায়েম করে বা মেনে নেয় তাদের জন্য কালিমা হচ্ছে " লা ইলাহা ইলান্নাছ"।

কালিমার দ্বিতীয় অংশ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

কালিমা তাইয়িবার দ্বিতীয় অংশের অর্থ হচ্ছে– মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল। রাসুল সা.-এর চরিত্রের মধ্যেই মুসলিম উম্মাহর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

অর্থঃ "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ'র রাসূলের জীবনটাই সর্বোত্তম আদর্শ।" (সূরা আহযাবঃ আয়াত ২১)

অর্থাৎ কেবল মাত্র রাসুল সা. ব্যাক্তিগত চরিত্রই নয় বরং তিনি যে জীবন-আদর্শ নিয়ে এসেছেন তা পুরোপুরিভাবে আমাদের জীবনে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে। আমরা যখন "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" বলি তখন মূলতঃ এ ঘোষণাই দেই যে তিনি যে জীবন-আদর্শ (ideology) ও পদ্ধতি (method) দিয়ে গেছেন, আমরা তার পূর্ণ আদর্শ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করব। রাসূলের আদর্শ ও পদ্ধতির বিপরীত কিছু হতে থাকলে তা পরিত্যাগ করব এবং তা প্রতিরোধ করব। এ ঘোষণার মাধ্যমে একজন মানুষ মুহাম্মাদ স. -কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে নিয়ে সকল কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

এখন দুনিয়াতে আমাদের জীবন-আর্দশগুলোর দিকে তাকানো যাক। বর্তমান সময়ে প্রচলিত বিভিন্ন জীবন-ব্যবস্থা হচ্ছে-

১. ইসলাম।

২. পুঁজিবাদী বা গণতন্ত্র।

৩. সমাজতন্ত্র বা কমনিউজম।

এবারে এ জীবন-ব্যবস্থাগুলোর সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

কমিউনিজমকে যারা জীবন-আদর্শ হিসেবে নিয়েছে :

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রাণী জগত বা বস্তু জগতের সকল কিছুকেই বস্তু (matter) হিসেবে তুলনা করা হয়। দেশের সকল সম্পদ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কোন সম্পদের মালিক হতে পারেন না। সকলে রাষ্ট্রের পক্ষে কাজ করবে এবং রাষ্ট্র তাদের জন্য যোগ্যতা অনুযায়ী ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবে। নাগরিকদের জীবন যাপনের সকল নিয়ম-কানুন এ ব্যবস্থা অনুযায়ী নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এটি একটি জীবন-ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে যে তারা ধর্ম এবং সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করে না। তাদের মতে সৃষ্টিকর্তার কোন অস্থিত্ব নেই। ফলে দুনিয়ার কোন কিছুই সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করেন নাই। যারা কমিউনিজম অনুযায়ী জীবন যাপন করছে বা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে, স্পষ্টতঃই তারা কমিউনজমকে জীবন-আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা "উসওয়াতুল হাসানা" বা উত্তম আদর্শ নিয়েছে মার্কস বা লেনীনকে।

পুঁজিবাদ বা গণতন্ত্রকে যারা জীবন-আদর্শ হিসেবে নিয়েছে :

পুঁজিবাদ বা গণতন্ত্র একটি জীবন আদর্শ। এ ব্যবস্থার কয়েকটি মৌলিক বিষয় হচ্ছে- ১. স্বার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হচ্ছে জনগণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জনগণ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করবে। ২. আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা জনগণের। ৩. জনগণ যেকোন সম্পদের মালিক হতে পারে। ৪. ধর্ম হচ্ছে ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং তা জীবনের কাজকর্ম থেকে আলাদা।

যেমন আমাদের পার্লামেন্টের সদস্যগণ যদি সূদ, মদ কিংবা পতিতাবৃত্তি বৈধ বলে আইন পাশ করে, তাহলে তা জনগণের জন্য আইনত: বৈধ বা হালাল হয়ে যাবে, যদিও তা কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী নিষিদ্ধ। এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা আইন পাশ করেছে যে, তারা পুরুষে-পুরুষে বিয়ে করতে পারবে। এখন এটা তাদের জন্য বৈধ বা হালাল। তাই দুনিয়ার সকল মানুষ এক হয়ে মতামত প্রদান করলেও একটি হারামকে হালাল কিংবা একটি হালালকে হারামে রুপান্তর করার অধিকার রাখে না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষেরা হালাল-হারাম নিজেরা নির্ধারণ করে।

এ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আর একটি প্রধান বিষয় হচ্ছে "ধর্ম থেকে জীবনকে আলাদা করে দেয়া।" মানুষরা কেবলমাত্র মসজিদ, মন্দির বা গির্জার মধ্যে যার যার ধর্ম পালন করবে এবং সমাজ জীবন বা রাষ্ট্রের অন্য সকল কাজ-কর্মে ধর্ম কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

একজন মুসলমানের জীবনের সকল আইন-কানুন অনুসৃত হবে পবিত্র কুরআন থেকে, একজন মুসলমান কখনোই আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত জীবন-ব্যবস্থা বাদ দিয়ে অন্য কোন ব্যবস্থা দ্বারা জীবন পরিচালনা করতে পারবেন না। আজকের সমাজের মানুষেরা 'পুঁজিবাদ বা গণতান্ত্রিক' ব্যবস্থা দ্বারা জীবন চালাচ্ছেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছেন। তারা "উসওয়াতুল হাসানা" বা উত্তম আদর্শ নিয়েছে গণতন্ত্রের প্রবক্তা আব্রাহাম লিংককে।

ইসলামকে যারা জীবন-আদর্শ হিসেবে নিয়েছে :

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি জীবন-ব্যবস্থা। আল্লাহ মানুষদের তৈরি করে পৃথিবীতে তাদের নিজেদের খেয়াল খুশির উপর ছেড়ে দেননি। মানুষরা পৃথিবীতে কিভাবে জীবন পরিচালনা করবে অর্থাৎ কিভাবে তারা অর্থনীতি পরিচালনা করবে, সম্পত্তির বন্টন কিভাবে হবে, সমাজ ও প্রতিবেশীর প্রতি দায়িত্ব কি হবে, একজন মানুষ কোন কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারবে, বিচারকার্য কোন আইন দ্বারা করবে, রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে, পররাষ্ট্র নীতি কি হবে এর যাবতীয় আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি, পবিত্র কুরআনে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ জীবন-বিধান মুসলমানদের জন্য ফরজ করেছেন। তাহলে মুসলমানরা কি আল্লাহর প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা বাদ দিয়ে অন্য জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের অধিকার রাখে?

ইসলামী ব্যবস্থাকে পুরোপুরিভাবে জীবনে গ্রহণ করলে কিংবা তা বাস্ত বায়নের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকলেই বলা যাবে যে তারা রসুলুল্লাহ সা. তারা "উসওয়াতুল হাসানা" বা উত্তম আদর্শ হিসেবে প্রর্গণ করেছে এবং তাদের নবী বা রাসুল হচ্ছেন মুহাম্মদ সা.।

রাসূলের কর্মপদ্ধতি তার জীবন-আদর্শ সকল কিছু মেনে নেয়াই মুসলমানদের মূল দায়িত্ব। সেজন্য পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ.

অর্থ: "যে রাসূলের অনুসরণ করল, সে যেন আল্লাহরই অনুসরণ করল।" (সূরা নিসা, আয়াত ৮০)

কিন্তু আমাদের সমাজের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষ রাসুলুল্লাহ্ সা. কে মান্য করার কথা বলেন কিন্তু তিনি যে ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন তা বাদ দিয়ে অন্য ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেন। যেমন কেউ সমাজতন্ত্র, কেউ গণতন্ত্র বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ করেন। সমাজের মধ্যে আরো অনেক মানুষ আছে যারা এভাবে বিভিন্ন মতাদর্শের ধারকদেরকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে। যারা যে আদর্শকে (ideology) গ্রহণ করেছে তারা সে আদর্শের প্রবক্তাকেই উছওয়াতুন হাছানা হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাহলে ঐ আদর্শের প্রবক্তাই হচ্ছে তাদের নবী বা রাসুল।

যারা সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে, তারা মার্কস বা লেনিনকে জীবনের উত্তম আদর্শ বা উছওয়াতুন হাছানা হিসেবে গ্রহণ করেছে। যারা পুঁজিবাদ বা গণতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে, তারা আব্রাহাম লিংকনকে জীবনের উত্তম আদর্শ বা উছওয়াতুন হাছানা হিসেবে গ্রহণ করেছে। যারা যে আদর্শকে গ্রহণ করেছে তাদের নবী বা রাসুল হিসেবে সে আদর্শের পুরুষকেই বুঝায়। অর্থাৎ যারা সমাজতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে তাদের নবী বা রাসুল হচ্ছে - মার্কস, লেনিন আর যারা গণতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে তাদের নবী বা রাসুল হচ্ছে আব্রাহাম লিংকন। এবং যারা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বায়নের জন্য কাজ করেন তাদের নবী বা রাসুল হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ সা.।
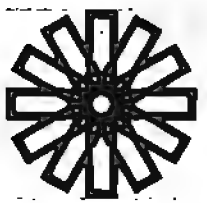
পূজিবাদ বা গণতন্ত্র ভিত্তিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার জন্য যারা কাজ করবে তারা মুহাম্মদ স.-এর আদর্শ (ideology) বাদ দিয়ে আব্রাহাম লিকনের আদর্শ গ্রহণ করেছে তাই তাদের নবী বা রাসূল হচ্ছে আব্রাহাম লিংকন। কমিউনজম বা সমাজতন্ত্র ভিত্তিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার জন্য যারা কাজ করবে তারা মুহাম্মদ সা.-এর আদর্শ (ideology) বাদ দিয়ে মার্কস বা লেনিনের আদর্শ গ্রহণ করেছে তাই তাদের তাদের নবী হচ্ছে মার্কস বা লেনিন। ইসলামী ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য যারা কাজ করছেন তারা মুহাম্মাদ সা. -এর আদর্শ গ্রহণ করেছেন

তাই তাদের নবী বা রসূল হচ্ছেন মুহাম্মাদ সা.। তাই রাসূলের সা. আদর্শ (ideology) বাস্তবায়নের দায়িত্ব থেকে কেউ সরে দাঁড়ালে সে রাসূল সা. কে মান্য করল না ফলে তার কর্ম দ্বারা সে কালিমাকে অস্বিকার করলো।

দীন কায়েমের পদ্ধতি নিতে হবে রাসূল সা.-এর জীবন থেকে :

রাসুলুল্লাহ সা. এ জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নের পদ্ধতি (method) দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি সা. পারিবারিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং আর্ন্ত জাতিক সকল ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করে গেছেন এবং উম্মাহকে তা পালন করার পথ দেখিয়ে গেছেন। কালিমার দ্বিতীয় অংশের দাবী হচ্ছে রাসুলুল্লাহ সা. এর আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করা এবং সেখানে কোন কিছু যোগ বা বিয়োগ করা যাবে না। তিনি যেভাবে দীন কায়েম করেছেন সে পদ্ধতি অনুসরণ করে দীন কায়েম করতে হবে।
প্রত্যেকটি জীবন আদর্শের মধ্যে দুটি অংশ থাকে। একটি হচেছ ফিকরা এবং অন্যটি হচ্ছে তরিকাহ। তরিকাহ অনুযায়ী ফিকরা বাস্তবায়ন করা হয়। ইসলামের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন হচ্ছে ফিকরাহ এবং রাসুল সা.-এর জীবন বা সুন্নাহ হচ্ছে তরিকা। এ তরিকাহ অনুযায়ী কুরআনের ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে।

তেমনি পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থারও দুটি অংশ রয়েছে। পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থার ফিকরাহ হচ্ছে- পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ এবং এর তরিকাহ হচ্ছে গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক তরিকাহ অনুযায়ী পুঁজিবাদ কায়েম করা হয়।
পুঁজিবাদী কুফর ব্যবস্থার মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে জীবন যাপনে অভ্যস্ত মুসলিম উম্মাহ আজ দীন কায়েম করতে গিয়ে তার নিজস্ব তরিকাহ বাদ দিয়ে কুফর তরিকায় অভ্যস্ত হয়ে পরছে। অধিকাংশ ইসলামী দল গণতন্ত্র নামক কুফর তরিকাহ দ্বারা আল্লাহর দীন কায়েম করতে কাজ করছে। গণতন্ত্র দ্বারা ইসলাম কায়েমের চেষ্টা আর যাই হোক ইবাদত হতে পারে না। দীন কায়েমের ক্ষেত্রে রাসূল সা.-এর পদ্ধতি পুরোপুরি অনুসরণ করতে হবে। অনেকে নিজেদের মনগড়া পদ্ধতিকে রাসূল সা.-এর পদ্ধতি হিসেবে চালিয়ে দিতে চান। রাসূল সা. কখনো বৈরাগ্যবাদ বা পীর ফকিরী বা মাজার কবর ব্যবস্থার দ্বারা দীন কায়েম করেন নি। এমনকি তিনি দীন

কায়েম করতে কোন রকম সহিংস পন্থাও অবলম্বন করেন নি। কিংবা তিনি কেবলমাত্র ব্যাক্তি পরিবর্তন করার কাজে বসে থাকেন নি এবং বলেন নি যে ব্যাক্তি পরিবর্তন হতে হতে দীন কায়েম হয়ে যাবে। কিংবা তিনি প্রচলিত কোন ব্যবস্থা মেনে নিয়ে কুফর ব্যবস্থার সাথে আঁতাত করে দীন কায়েমের কাজ করেন নি। তিনি মক্কার দারুল নদওয়ার সদস্য হন নি। কিংবা মক্কার জাহিল সমাজের কোন আপোষ প্রস্তাবও মেনে নেন নি। আজকে আনেকে দীন কায়েম করতে গিয়ে নিজেদের মনগড়া পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করছেন এবং রাসূল সা.-এর পদ্ধতি বলে অনুযায়ী চালিয়ে দিচ্ছেন। এটি কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

রাসূল সা. দীন কায়েম করতে গিয়ে ব্যাক্তিগত পর্যায়ে দাওয়াত দিয়েছেন, দলবদ্ধভাবে সাহাবাদের নিয়ে প্রকাশ্যে দাওয়াত দিয়েছেন, মক্কার কুফর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, মক্কার সমাজ নীতি, অর্থনীতি, ইবাদত করার পদ্ধতি নিয়ে কথা বলেছেন, কুফর ব্যবস্থার মোকাবেলা করেছেন, বিনিময়ে অত্যাচারিত, নির্যাতিত হয়েছেন। কিন্তু কখনো কুফর ব্যবস্থার কাছে মাথানত করেন নি কিংবা তাদের সাথে কোন আঁতাত ও আপোষ রফা করে ক্ষমতার ভাগাভাগি করেতে যান নি।
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূলুল্লাহ সা. তৎকালীন আরবের শক্তিশালী যোদ্ধা সম্প্রদায় ও গোত্র প্রধানদের আহ্বান করেছেন। তাদের সাথে আলোচনা করেছেন। পরিশেষে, আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করে আউস এবং খাযরায গোত্রের সহায়তায় মদিনাতে খিলাফত রাষ্ট্র কায়েম করেছিলেন। এভাবেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
দীন কায়েম করার সঠিক পদ্ধতি ব্যাখা করতে হলে তা দীর্ঘ আলোচনার দাবী রাখে। এখানে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা দীঘায়িত করলাম না। এজন্য গভীরভাবে সিরাত গ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন করতে হবে।
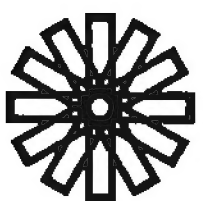
পরিশেষে বলা যায়, যারা সুন্নাহ বাদ দিয়ে গণতন্ত্র দ্বারা দীন কায়েমের কাজ করছেন তারা মূলতঃ রাসুল সা.-এর পদ্ধতি অমান্য করছেন এবং প্রকারান্তে কালিমার দ্বিতীয় অংশকে অস্বীকার করছেন।

এক নজরে কালিমা তাইয়িবার দাবী :

প্রথম অংশঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

১। ইলাহ কিভাবে হয় তা বুঝতে হবে আল্লাহ ছাড়া সকল প্রকার ইলাহ্কে অস্বীকার করা এবং প্রতিহত করা।

২। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাহায্যকারী মনে না করা;

৩। খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে আল্লাহর কোন হুকুম অমান্য না করা।

৪। কারো জন্য কিছু মান্নত না করা।

৫। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো আইন না মানা।

৬। কুরআনের আইনের সাথে সাংঘর্ষিক কোন ব্যবস্থা না মানা।

৭। এমন কোন দলে যোগ না দেয়া যার আন্দোলনের ফলে অনৈসলামী বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় অংশঃ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

১। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ রাসূল হিসেবে মানা।

২। তাঁর মাধ্যমে যে জীবন ব্যবস্থা পাঠানো হয়েছে তা বাস্তবায়ন করা।

৩। তাঁকে সা. জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা এবং অন্য কোন মানুষের দেয়া জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

৪। দীন কায়েম করতে গিয়ে রাসুল সা.-এর পদ্ধতি অনুসরণ করা অন্য গণতন্ত্র বা অন্য সকল পদ্ধতিকে অস্বীকার করা।

৫। কোন কাফির বা ফাসিককে নেতা হিসেবে মান্য না করা।

৬। অনৈসলামী শাসকদের মান্য না করা।

: আবার ও গোড়ার কথা :

কালিমা জেনে মুসলমান হওয়া এবং না জেনে মুসলমান হওয়া:

ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবের লোকেরা কালিমার মর্মার্থ বুঝে শুনেই মুসলমান হয়েছিলেন। তারা কালিমাকে একটি ব্যবস্থা হিসেবে বুঝেছিলেন। ফলে তারা সে ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ববান ছিলেন। ইসলাম পূর্ব তারা কাকে কাকে ইলাহ মানত সে বিষয়টিও তাদের কাছে পরিস্কার ছিল। তারা আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মান্য করত

এবং একই সাথে বিভিন্ন বিষয়ে অন্যদের ইলাহ মানত। ফলে তারা যখন কালিমা বুঝে মুসলমান হয়েছে তখন তাদের প্রচলিত ইলাহগুলোকে ত্যাগ করা ও অস্বীকার করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করেছেন।
আমরা জন্মসূত্রে মুসলমান হয়েছি। অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার জন্য কালিমার তাৎপর্য উপলব্ধি করার প্রয়োজন হয়নি। আমরা কোথায় কোথায় অন্য দের ইলাহ মেনে শিরকের মধ্যে ডুবে আছি সে বিষয়টিও আমাদের অনেকের কাছে পরিস্কার নয়। ফলে আমরা সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহকে মান্য করলেও সমাজের বিভিন্ন বিষয়ে অন্যকে ইলাহ হিসেবে মান্য করে জীবন চালাচ্ছি। যা মূলত: কালিমাকে অস্বীকার করার শামিল। অর্থাৎ কালিমা না বোঝার ফলে একদিকে আমরা কালিমা উচ্চারণ করছি এবং অন্য দিকে আমাদের কাজের দ্বারা কালিমাকে অস্বীকার করছি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ইলাহ'র চেহারা আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন এবং এসকল ইলাহকে বর্জন করার জন্য তাকিদ দিয়েছেন। আমরা যদি একদিকে কালিমা উচ্চারণ করি এবং অন্য দিকে আল্লাহ ছাড়া বিভিন্ন শক্তি ও ব্যবস্থাকে ইলাহ মান্য করি তাহলে তা হবে মূলত: কালিমাকে অস্বীকার করারই নামান্তর।
কালিমা মান্য করার মানে হচ্ছে অন্য সকল ইলাহ'র শিকড় উপরে ফেলা এবং তাদের অস্বীকার করা। যে সকল ইলাহ'র ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আমাদেরকে অবশ্যই সে সকল ইলাহ'র শিকড় উপরে ফেলে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কায়েম করতে হবে।

বর্তমানেও এ তাগুতী শক্তি পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র আর ধর্মরিপপেক্ষতার ছদ্মাবরণে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। কালিমার সঠিক দাওয়াত দিতে গেলেই এ তাগুতী শক্তির সাথে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে। এ অনিবার্য সংঘাতে ইসলামকে বিজয়ী করাই মুসলমানদের একমাত্র দায়িত্ব।

আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন। আমীন।

ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদা ও সুমহান আদর্শ সবার কাছে পৌঁছে দিতে আপনিও অবদান রাখুন

খান প্রকাশনীর বই কিনুন, পড়ুন অপরকে হাদিয়া দিন
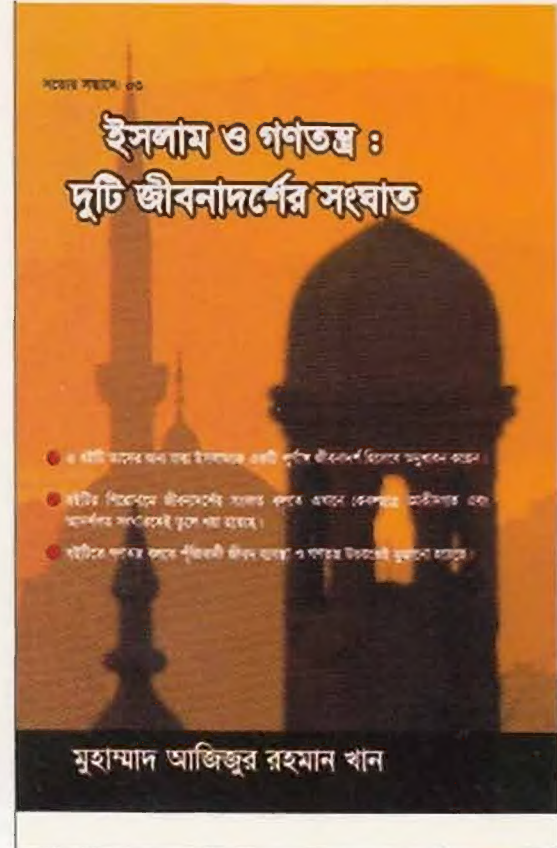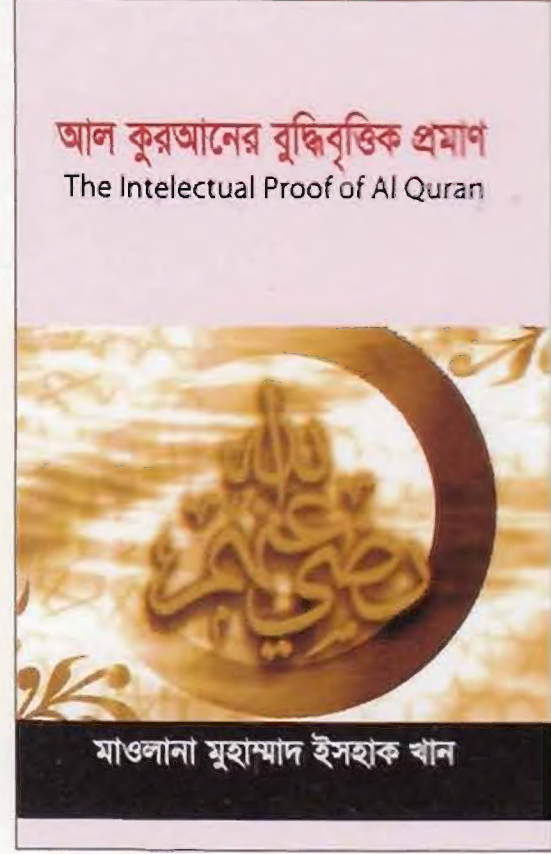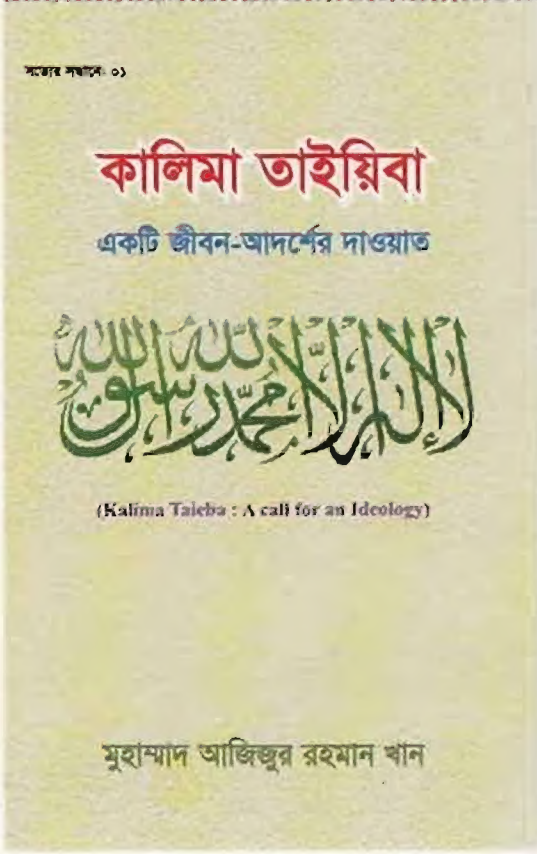
(নির্ভরযোগ্য প্রকাশনায় অঙ্গীকারবদ্ধ)

দোকান নং ২৫, ৬ষ্ঠ তলা, ইসলামী টাওয়ার

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। মোবা: ০১৭৪০১৯২৪১১।

Email: abuumayer.khan@gmail.com